সাতদিন

৫ মার্চ : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদের অন্তর্বর্তী জামিনের আদেশ স্থগিত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জিম্মি তিন বিদেশী প্রকৌশলীর মুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও নানামুখী ঘোরপ্যাঁচে পুরো প্রক্রিয়া আবারও বিলম্বিত হচ্ছে।

৬ মার্চ : রাজধানীর নিউ ইস্কাটন রোডে গণডাকাতি হয়েছে। ভোরে সংঘবদ্ধ ডাকাতরা মাইক্রোবাস নিয়ে আটটি দোকান হতে পৌনে ১৩ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

৭ মার্চ : ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মহিমায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে দেশব্যাপী পবিত্র ঈদুল আযহা তথা কোরবানির ঈদ উদ্‌যাপিত হয়েছে।

বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঈদের দিন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে আগামী মে মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন চেয়েছেন।

৮ মার্চ : তেজগাঁও থানার পুলিশ গ্রিন রোডস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসের বাগান হতে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের লাশ উদ্ধার করে। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৯ মার্চ : দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অপহৃত তিন বিদেশী প্রকৌশলী মুক্তি পাননি।

গুলশান থানার কাছে শিশু পার্কের সম্মুখে একটি পাজেরো জিপে গুলি করে দুই তরুণীকে অপহরণের চেষ্টার সময় অস্ত্রসহ চিফ হুইপ পুত্র সাদিক আবদুল্লাহ ও তার দুই সহযোগীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১০ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১২ জুনের আগেই জনগণের রায় গ্রহণে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত রয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা নির্বাচন দিতে চাই।

একদল সন্ত্রাসী মতিঝিলস্থ ট্রান্সকম লিমিটেডের ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে কর্মচারী শিহাবকে ছুরিকাঘাত করে ১২ লাখ টাকা নিয়ে যায়।

১১ মার্চ : চীন হতে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মে মাসেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি পুনরুল্লেখ করেছেন।

তিন বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারের অপহরণের ২৪ দিন পরও তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

হঠাৎ নির্বাচন

এখন চলছে দু'নেত্রীর কথার যুদ্ধ। শেখ হাসিনা বেগম জিয়াকে কোনোক্রমেই নির্বাচনের আগে কোনো বিজয় দিতে রাজি নন। তার নিজের টার্মে নির্বাচনের সময় ঠিক করে হাসিনা ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে চান। আর সে কারণেই তিনি নির্বাচনের সময় নিয়ে বেগম জিয়ার ছোঁড়া তীর ফিরিয়ে দিয়েছেন...

লিখেছেন অনিরুদ্ধ ইসলাম

নির্বাচন নিয়ে মুখরিত রাজনীতির মাঠ। অনেকটা হঠাৎ করেই শুরু হলো এ আবহ। মে নাকি জুন কোন মাসে নির্বাচন হবে তা নিয়ে এ মুহূর্তের বিতর্ক।

বেশ একটা চমক দেন বিরোধীদল নেত্রী বেগম জিয়া। ঈদ সাক্ষাতে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে তিনি মে মাসে নির্বাচন দেয়ার কথা বলেন। তার সেই চমক ফিরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিরোধীদল নেত্রীর মে মাসের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তার দল বারো জুনের আগেই জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তিনি চান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করতে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ কেবল শুকনো মৌসুমেই সুবিধামত ভোট দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের মধ্যে যে কথার মারপ্যাঁচ চলছিল তার আপাত অবসান ঘটল বলে মনে হয়। সংবিধান অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্তি হলেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই জাতীয় সংসদ ভেঙে যাওয়ার কথা। সংসদ ভেঙে যাওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে নতুন সংসদ নির্বাচন করতে হবে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। সে অনুযায়ী পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্তি অন্তে সংসদ ভেঙে গেলে অক্টোবর মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধী চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম করার জন্য দাবি তোলা হয়। অবশ্য বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিরোধীদল বিএনপি সরকারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে আসছে।

সরকারকে ক্ষমতাত্যাগে বাধ্য করা ও মধ্যবর্তী নির্বাচন দেয়ার জন্য সংসদ থেকে তারা একযোগে পদত্যাগের কথাও বলেছিল। অবশ্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের ছেড়ে দেয়া আসনে উপনির্বাচন করিয়ে নিতে পারে এই আশংকায় তারা আর সংসদ থেকে পদত্যাগ করেনি। বরং টানা নব্বই দিন অনুপস্থিত থাকার কারণে সংবিধানের বিধি অনুসারে সংসদ সদস্যপদ শূন্য হয়ে যাবে বিধায় তারা এর মাঝে কিছু সময়ের জন্য সংসদে ফিরে এসে তাদের আসন রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়। তবে পাশাপাশি বিরোধী চারদলের জোট নির্বাচনের আগেই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাদের চাপ বৃদ্ধি করছিল। বিরোধী জোটের হিসাব অনুযায়ী নির্বাচনের আগে সরকারকে তাদের আন্দোলনের কাছে পরাজিত করতে না পারলে নির্বাচনের বিজয় নিশ্চিত করা যাবে না। সে কারণেই তারা একুশে মার্চে পল্টনের সমাবেশ থেকে সরকারকে পদত্যাগের সময় বেঁধে দিয়ে আল্টিমেটাম দেবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু কুশলী রাজনীতিক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া তুলে নেয়ার জন্য ঘোষণা দেন যে বিরোধীদল নেত্রী সংসদে এসে যখনই নির্বাচনের সময় চাইবেন তিনি তখনই নির্বাচন করতে রাজি থাকবেন। পরে আরেক ধাপ এগিয়ে ঐ শর্ত তুলে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে বিরোধীদল নেত্রী যে কোনো স্থান থেকে নির্বাচনের সময় চাইবেন তিনি তাতেই রাজি

হবেন। প্রধানমন্ত্রী তার এই ঘোষণার সাথে একথাও জুড়ে দেন যে, আসলে বিএনপি'র চারদলের জোট ও বিরোধীদলের নেত্রী নির্বাচন চায় না। তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে চায়। তার দল ঐ ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করবে না।

প্রধানমন্ত্রীর এই কুশলী ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলনেত্রীকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে ধরে নির্বাচনের সময় চাওয়ার জন্য বিরোধীদল নেত্রীর ওপর দলের অভ্যন্তর থেকেই চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। যদিও চারদলের জোটের শরিক জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট এতে রাজি ছিল না। কারণ জাতীয় পার্টির নেতা এরশাদ এখনও জেলে এবং জনতা টাওয়ার দুর্নীতি মামলায় দন্ডাদেশের কারণে তার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোনো সুযোগ নাই। একই কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নাই দলের মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জুরও। ইসলামী ঐক্যজোটের মুখ্য নেতারাও রয়েছেন জেলে । চারদলের জোটের তরফ থেকে আসন ছাড় না দিলে তাদের কারও পক্ষে নির্বাচনে বিজয় লাভ করা সম্ভব হবে না। আর নেতারা জেলে থাকায় নির্বাচনের ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত নয়। বিরোধীদল নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব তাই এই বলে উড়িয়ে দেন যে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের তারিখ দেয়ার কোনো এখতিয়ার নাই। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে নির্বাচন কমিশন সব রাজনৈতিক দলের সাথে বসে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করবে।

ঈদের ছুটির অবকাশে বিরোধীদল নেত্রী হঠাৎ করে মত পাল্টে ফেলেছেন বলে মনে হয়। রাষ্ট্রপতির সাথে ঈদের সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি তাকে জানান যে তিনি মে মাসে নির্বাচন চান এবং এ কারণে তিনি রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দিতে অনুরোধ জানান। এর জবাবে দলনেতারা ভিন্ন কথা বললেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরবে প্রবাসী বাঙালিদের এক সমাবেশে বলেন যে তার দল জুন মাসের মধ্যেই নির্বাচনে রাজি আছে। এখন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলনেত্রী দেশে ফিরে এলে ঐ নির্বাচনের সঠিক দিন-তারিখ কি হয় সেটা দেখার অপেক্ষা।

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদল নেত্রীর এই হঠাৎ করে মত পরিবর্তন অবশ্য কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠীগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর দু'টি দলের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ওপর বেশ কিছু দিন থেকেই জোর দিচ্ছিল। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধীদল বিএনপি'র মুখোমুখি অবস্থানের কারণে দাঁতাগোষ্ঠীরা তাদের দেয়া সাহায্যের ব্যবহার নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। সে কারণেই নির্বাচনের আগে তারা সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হয় নাই। কেবল সাহায্য প্রদান নয়, দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ নিয়েও উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে গ্যাস ও তেল ক্ষেত্রগুলোর ইজারা প্রদান এবং গ্যাস রপ্তানির বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল নেত্রী নির্বাচনের আগে এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি নন। সুতরাং দাঁতাগোষ্ঠী চাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন শেষ করে এসব বিষয়ে নতুন সরকারের সাথে একটা ফায়সালায় আসার জন্য।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতি দাঁতাগোষ্ঠীর সমর্থন হ্রাসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক একটি রিপোর্ট প্রদান করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জিম্মি নাটক ও পার্বত্য শান্তিচুক্তির ব্যাপারে শেখ হাসিনার সরকারের মনোভাব ভাবমূর্তিকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে বিরোধীদলের ওপর কোনো দোষ চাপাতে পারছে না। বরং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি এই জিম্মি নাটকের জন্য সরকারকেই দায়ী করেছে। পনেরোদিন পরও জিম্মি উদ্ধার না হওয়ায় পশ্চিমা দেশগুলি খুবই নাখোশ। তারা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি দাবি করেছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিরোধীদলের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। ইসলামপন্থি দলগুলি বহুদিন পর শেখ হাসিনাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। গত নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা নিজেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেয় এবং কিছুটা সফলও হয়। বেগম জিয়া তার বিরুদ্ধে ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করার অভিযোগ আনলেও সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু সম্প্রতি ইসলামপন্থিদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা শেখ হাসিনাকে কিছুটা হলেও বিপাকে ফেলে দিয়েছে। চরমমোনাইর পীর ঘোষণা করেছে যে যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে তারা মুসলমানিত্ব হারাবে। অন্যদিকে ইসলামী ঐক্যজোট হাসিনার বিরুদ্ধে জেহাদের আহ্বান দিয়েছে। বিরোধীদলনেত্রী বেগম জিয়া কেবল ইসলামপন্থিদের নিয়ে জোট বাঁধেননি, তাদের অন্যায় কাজেও (উদাহরণ— মসজিদে পুলিশ কনস্টেবল হত্যার ঘটনা) সমর্থন দিচ্ছেন। চারদলের সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হলে ইসলামপন্থি দলগুলি কিছুটা হলেও আরো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুসলিম ভোট হাসিনার বিরুদ্ধে চলে যাবার সম্ভাবনা। হাসিনা এ সুযোগ দিতে রাজি নয়।

'মে মাসের মধ্যে নির্বাচন দিন'
বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া

'১২ জুনের আগেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আওয়ামী লীগ'
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ডা. ইকবালের নেতৃত্বে হরতাল বিরোধী মিছিল থেকে গুলি করে মানুষ হত্যার ঘটনাও হাসিনাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। সরকারি দল একে সাবোটাজ বললেও এ ঘটনা সন্ত্রাসী স্বরূপকে জনগণের সামনে তুলে ধরেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ইকবালের ঘটনা শহরাঞ্চলে আওয়ামী লীগের ভোট কমাবে। মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতা থাকার সময় এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সে সব পরিস্থিতি সামাল দেয়া মুশকিল হবে।

এখন চলছে দু'নেত্রীর কথার যুদ্ধ। শেখ হাসিনা বেগম জিয়াকে কোনোক্রমেই নির্বাচনের আগে কোনো বিজয় দিতে রাজি নন। তার নিজের টার্মে নির্বাচনের সময় ঠিক করে হাসিনা ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে চান। আর সে কারণেই তিনি নির্বাচনের সময় নিয়ে বেগম জিয়ার ছোঁড়া তীর ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনের দু'জন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে সরকার ও বিরোধীদল এখন অবস্থান করছে একেবারে দু'প্রান্তে। আগামী এপ্রিলে নির্বাচন কমিশনার আবিদুর রহমান ও মোশতাক আহমদ চৌধুরী অবসর নিচ্ছেন। ঐ দু'জায়গায় আওয়ামী লীগ চায় তাদের মনোনীত প্রার্থী বসাতে। অন্যদিকে বিএনপি চাচ্ছে কেয়ারটেকার সরকার অতিসত্বর ক্ষমতা গ্রহণ করে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে সমাধা করুক। বিএনপি যে 'জনতার মঞ্চ' খ্যাত অপর নির্বাচন কমিশনার সফিউর রহমানকে কোনোভাবেই সমর্থন করবে না, সে কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। সবশেষের খবর অনুসারে স্বাধীনতা দিবসের জাঁকজমক অনুষ্ঠান পালনের পর শেখ হাসিনা পদত্যাগ করবেন। এবং তারপরই নির্বাচন।

কল্পরঞ্জনের জিম্মি নাটক...

বিপদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে সরকার এখন সাহায্য চাইছে সন্তু লারমার। সেনাবাহিনী প্রধান এখন সন্তু লারমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিম্মি উদ্ধারে তার সহযোগিতা কামনা করছেন... লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

ধারণাটা করেছিল আর্মি। অন্যরাও সেই ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিল। দ্বিমত পোষণ করেছিলেন একজন। তার নাম কল্পরঞ্জন চাকমা। আওয়ামী সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

ধারণাটা ছিল সেনা কর্ডন তুলে না নিলে তিন বিদেশীকে নিয়ে অপহরণকারীরা আরো দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের গভীরে চলে যাবে। চলে যাবে সেনাবাহিনীর আওতার বাইরে। তখন অপহরণকারীরা যা চাইবে সেটা দিয়েই বিদেশীদের মুক্ত করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে জিম্মি উদ্ধার প্রক্রিয়ার যাবতীয় দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কল্পরঞ্জন চাকমাকে। কল্পরঞ্জন চাকমার দাবির মুখে সেনা কর্ডন শিথিল করা হয় এবং অপহরণকারীদের জন্যে তৈরি করা হয় 'সেভ প্যাসেস'। কল্পরঞ্জন বলেছিলেন বিদেশী তিন জিম্মিকে মুক্তি দিয়ে অপহরণকরীরা 'সেভ প্যাসেস' দিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। এ বিষয়ে একটি মৌখিক চুক্তি হয়েছে অপহরণকারীদের সঙ্গে কল্পরঞ্জন চাকমার। অপহরণকারীরা 'সেভ প্যাসেস' দিয়ে চলে গেছে ঠিকই তবে তিন বিদেশীকে মুক্তি দিয়ে নয়, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে।

এই ঘটনার পর সুর বদলে ফেলেন কল্পরঞ্জন চাকমা। তিনি বলতে থাকেন, পত্রিকাগুলোর বিভ্রান্তিকর খবরের কারণেই অপহরণকারীরা বিদেশীদের মুক্তি দেয়নি। নিজের ব্যর্থতার যাবতীয় দায়দায়িত্ব তিনি পত্রিকাগুলোর ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন।

উল্লেখ্য, কল্পরঞ্জন চাকমা দাবি করেছিলেন অপহরণকারীদের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে। তিনি আরো বলেছিলেন, অপহরণকারীরা অনেক দূরে অবস্থান করছে। সেখান থেকে আসতে দু'দিন সময় লাগে। সাংবাদিকরা নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী লিখেছিল, এক কোটি টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে তিন বিদেশী জিম্মি মুক্তি পাচ্ছেন। জানা যায়, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ঝামেলার কারণেই অপহরণকারীদের সঙ্গে কল্পরঞ্জন চাকমার আলোচনা ভেঙে যায়। কেউ স্বীকার না করলেও একথা সত্য যে, মুক্তিপণের এই এক কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছিল ক্যামসেক্স ইন্টারন্যাশনাল নামক ডেনিস কোম্পানি। জানা যায়, মধ্যস্থতাকারীরা টাকার প্রায় পুরো অংশটি রেখে মাত্র দু'তিন লক্ষ টাকা দেয় অপহরণকারীদের। এর মধ্যে অপহরণকারীরা জেনে যায় এক কোটি টাকার বিষয়টি। ভেঙে যায় আলোচনা। এক পর্যায়ে কল্পরঞ্জন চাকমা স্বীকার করেন তার সঙ্গে অপহরণকারীদের সরাসরি যোগাযোগ হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় পূর্বে তিনি অসত্য দাবি করেছিলেন।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত সংখ্যার লেখায় বলা হয়েছিল, কল্পরঞ্জন চাকমা নিজে বিপদে পড়েছেন, সরকারকেও বিপদে ফেলছেন। এখন এটা প্রমাণিত সত্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বীকৃত নেতা জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের পক্ষে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেছেন। এই চুক্তির সময়ে কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার বা বীর বাহাদুররা কোথাও ছিলেন না। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ জানে তাদের জন্যে সংগ্রাম করছে জনসংহতি সমিতি। যার নেতা সন্তু লারমা। একথা সরকারও জানে যে সন্তু লারমাই পাহাড়িদের একমাত্র পরীক্ষিত নেতা। তাকে বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো সমস্যারই সমাধান করা যাবে না।

'চুক্তির পর থেকেই আমরা সরকারকে বলেছি চুক্তি বিরোধী গ্রুপের তৎপরতা বন্ধের উদ্যোগ নিতে। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তো নেয়ইনি বরং তাদের শেল্টার দিয়েছে'

পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্তু লারমা এবং কল্পরঞ্জন, দীপঙ্কর তালুকদারদের অবস্থান বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যায়। গত ২ ডিসেম্বর ছিল শান্তিচুক্তির তিন বছর পূর্তি। এ উপলক্ষে জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটিতে একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিল। একই দিনে আওয়ামী লীগও চুক্তির তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে সমাবেশ ডেকেছিল রাঙ্গামাটিতে। জনসংহতি সমিতির সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সন্তু লারমা। আর আওয়ামী লীগের সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন দীপঙ্কর তালুকদার। জনসংহতি সমিতির সমাবেশে মানুষ হয়েছিল কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ হাজার। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার পাহাড়ি এসেছিল সন্তু লারমার কথা শুনতে।

আওয়ামী লীগের জনসভায় দীপঙ্কর তালুকদারের কথা শুনতে এসেছিল কতজন? ২৭৬ জন। আশ্চর্য শোনালেও গুনতে গিয়ে এরচেয়ে বেশি মানুষ সেই সমাবেশে পাওয়া যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কার অবস্থা কেমন সেটা বোঝানোর জন্যে সম্ভবত আর কোনো উদাহরণের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সরকার বিপদের সময় সন্তু লারমাদের দূরে ঠেলে দিয়ে কাছে টেনেছিল কল্পরঞ্জন, দীপঙ্কর তালুকদারদের। সরকার প্রমাণ করতে চাইছিল কল্পরঞ্জনরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান শক্তি, সন্তু লারমারা কোনো ফ্যাক্টর নয়।

কিন্তু সরকার সেটা প্রমাণ করতে পারেনি। বিপদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে সরকার এখন সাহায্য চাইছে সন্তু লারমার। সেনাবাহিনী প্রধান এখন সন্তু লারমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিম্মি উদ্ধারে তার সহযোগিতা কামনা করছেন। কারণ আর কেউ না জানলেও সেনাবাহিনী খুব ভালো করেই জানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির শক্তি কতটা। আর পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে জনসংহতি সমিতি এখন সংগঠিত শক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ প্রশাসন চলে 'হেডম্যান', 'কারবারী'দের মাধ্যমে। আর এই 'হেডম্যান' এবং 'কারবারী'দের প্রায় সবাই জনসংহতি সমিতির সদস্য। তাদেরকে বাদ দিয়ে যে ভাষায়ই লিফলেট বিতরণ করা হোক না কেন, সেটা যে পাহাড়িদের মধ্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারবে না, এটা বোঝার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন হয় না।

আওয়ামী সরকার এবং সেনাবাহিনীর ওপর জনসংহতি সমিতির অনেক ক্ষোভ এবং অভিমান জমা হয়েছে। এ বিষয়ে সন্তু লারমা ২০০০কে বলেছেন, 'চুক্তির পর থেকেই আমরা সরকারকে বলেছি চুক্তি বিরোধী গ্রুপের তৎপরতা বন্ধের উদ্যোগ নিতে। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তো নেয়ইনি বরং তাদের শেল্টার দিয়েছে। প্রকাশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় মিটিং করেছে, আমার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা

কল্পরঞ্জনের সঙ্গে অপহরণকারীদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ না হলেও তিনি এই মিথ্যা দাবি করলেন কেন? সেভ প্যাসেস তৈরি করে অপহরণকারীদের তিনি নিরাপদে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন কেন

মেরেছে। পুলিশ-আর্মি তাদের কখনো ধরেনি।'

চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ-ই যে অপহরণ করেছে এটা এখন পরিষ্কার। এই গ্রুপের অনেকের সঙ্গেই কল্পরঞ্জন চাকমা এবং দীপংকর তালুকদারদের সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। তাই কল্পরঞ্জন চাকমা শুরু থেকেই ৯ কোটি টাকা মুক্তিপণ দেয়ার জন্যে তৎপর ছিলেন। এই পরিমাণ টাকা প্রসিত- সঞ্চয়রা পেলে অনেক অস্ত্র কিনতে পারবে। সন্তু লারমাদের বিপক্ষে একটি শক্ত প্রতিপক্ষ দাঁড়াবে-এমনটাই চেয়েছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা।

কিন্তু কল্পরঞ্জনের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেনাবাহিনী। স্বাভাবিক-ভাবেই সেনাবহিনীর সঙ্গেও তার বিরোধ তৈরি হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অনেক দুর্নাম আছে। কিন্তু এই জিম্মি ঘটনায় সেনাবাহিনী তাদের দুর্নাম বেশ কিছুটা ঘুচিয়েছে। সেনাবাহিনী দক্ষতার সঙ্গে কর্ডন করে রেখেছিল বলেই অপহরণকারীরা বিশাল কিছু মুক্তিপণ দাবি করতে পারেনি। দাবিকৃত ৯ কোটি টাকার পরিবর্তে বিনা মুক্তিপণেই জিম্মিদের ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থে কল্পরঞ্জন চাকমা সেনা কর্ডন শিথিল করতে বাধ্য করেন। যার সুযোগ নিয়ে অপহরণকারীরা চলে যায় পাহাড়ের গভীরে। যদিও এখনো সেনাবাহিনী দাবি করছে সেনা কর্ডনের ভেতরে রয়েছে অপহরণকারীরা। আরো ত্রিশ কিলোমিটার এলাকায় সেনা কর্ডন বিস্তৃত করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তিন স্তর বিশিষ্ট সেনা কর্ডনের প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের বাইরে চলে গেছে অপহরণকারীরা।

কল্পরঞ্জন চাকমা একের পর এক হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়িদের। যে ভাষায় সেনাবাহিনীও কথা বলে না, তিনি সেই ভাষায় কথা বলছেন পাহাড়িদের সঙ্গে। কল্পরঞ্জন বলেছেন, 'অপহরণকারীদের সন্ধান না দিলে চাকমাদের খালি ভিটা রোদ পোহাবে।' অর্থাৎ সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। এই হুমকির পর পাহাড়িরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আর এই হুমকির ফলে পাহাড়িদের মাঝে কল্পরঞ্জনের নিজের অবস্থা তো খারাপ হয়েছেই, আওয়ামী লীগের অবস্থাও খারাপ হয়েছে। নিজের ব্যর্থতার দায় তিনি সাংবাদিক এবং গ্রামবাসীর ওপর চাপাতে চাইছেন।

এই অপহরণ ঘটনায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। জিম্মি উদ্ধার প্রক্রিয়াকে হযবরল করে ফেলেছেন কল্পরঞ্জন চাকমা। আওয়ামী সরকারের উচিত কল্পরঞ্জনের কাছে কিছু প্রশ্নের জবাব চাওয়া।

কল্পরঞ্জন চাকমা নিজেই বলেছেন, অপহরণকারীদের কাছে পৌঁছাতে দুই দিন সময় লাগে। কিন্তু পত্রিকা সকালবেলা রাঙামাটিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপহরণকারীরা মুক্তিপণের খবর জানলো কীভাবে? ওয়ারলেসে? এই খবরটি পৌঁছালো কে? কল্পরঞ্জন চাকমা নিজে নয়তো?

কল্পরঞ্জনের সঙ্গে অপহরণকারীদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ না হলেও তিনি এই মিথ্যা দাবি করলেন কেন? সেভ প্যাসেস তৈরি করে অপহরণকারীদের তিনি নিরাপদে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন কেন?

সেনাবাহিনী অপারেশন করবে অপহরণ-কারীদের থেকে জিম্মি উদ্ধারের জন্যে। এতে হয়ত পাহাড়ি গ্রামবাসীর কিছু ক্ষয়ক্ষতি হবে। কিন্তু আর্মি কেন পাহাড়িদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেবে? এই হুমকি দিয়ে কী তিনি সেনাবাহিনীকে 'ভয়ঙ্কর প্রাণী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন না? যতদূর জানা যায়, বর্তমানে তো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের। এই হুমকির ফলে আর্মির ভাবমূর্তি কতটা বাড়লো?

বারবার আলটিমেটাম দিয়ে সরকারকে, বাংলাদেশকে হাস্যকর অবস্থায় ফেলছেন কেন কল্পরঞ্জন চাকমা?

দীপঙ্কর তালুকদারের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে তার বিরোধ থাকতেই পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে দেশের প্রশাসন এবং বিদেশীদের সামনে সেটা প্রকাশ করে সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেললেন কেন কল্পরঞ্জন চাকমা?

বিদেশী জিম্মি অপহরণকে নাটকে রূপান্তরিত করার একক কৃতিত্ব যার, সেই কল্পরঞ্জন চাকমার কাছে এই প্রশ্নগুলোর জবাব কী চাইবেন আওয়ামী সরকার?

তার কাছে এই প্রশ্নগুলোর মানসিক শক্তি সম্ভবত নেই আওয়ামী সরকারের। কারণ কল্পরঞ্জনের মতো ভুল লোককে তারাই পছন্দ করেছে। এর জন্যে মূল্য তো তাদের দিতেই হবে।

আবার সাদেক আব্দুল্লাহ

চীফ হুইপ পুত্র আবারো সংবাদ শিরোনামে। চীফ হুইপ পুত্রদের সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। কলাবাগানের বাড়ি দখলের ঘটনার পর চীফ হুইপের পুত্র সাদেক আব্দুল্লাহর সন্ত্রাসের শিকার হলো আরেকটি পরিবার। শিল্পপতি নূরুল হক শিকদারের স্ত্রী ও তার মেয়ে এবং দুই নাতিকে বহনকারী গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, শুক্রবার রাত ১টায় নূরুল হক শিকদারের ধানমন্ডি বাসা থেকে পারিবারিক অনুষ্ঠান শেষে তার স্ত্রী দুই কন্যাকে বারিধারার বাসায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। পাজেরো জিপে যাত্রী ছিলেন পাঁচজন। নূরুল হক, স্ত্রী, দুই মেয়ে ছাড়া দুই নাতনি ছিলেন। গাড়িটি গুলশান ওয়াভার ল্যান্ড পার্কের কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার গাড়িটির গতিরোধ করে। অস্ত্র উঁচিয়ে প্রাইভেট কার থেকে নেমে আসে চীফ হুইপ ছেলে সাদেক আব্দুল্লাহ ও তার বন্ধু মামুন এবং রিজভী। পাজেরো গাড়িটি লক্ষ্য করে তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। হতচকিত গাড়ির যাত্রীরা মাথা নিচু করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। গাড়ির ড্রাইভার মান্নান গাড়ি ঘুরিয়ে গুলশান ২ নম্বর দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের জাহাঙ্গীর গেটে ঢুকে পড়েন। সাদেক আব্দুল্লাহর গাড়িও গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাদের ফলো করে। চেকপোস্টের কাছে এলে মিলিটারি পুলিশ সাদেক আব্দুল্লাহ ও তার সহযোগীদের আটক করে গুলশান থানায় সোপর্দ করে। গুলশান থানা পুলিশ তাদের রাতভর থানায় আটক করে রাখে। কিন্তু বরাবরের মতো এবারও বাবার দাপটে ছাড়া পেয়ে যান সাদেক আব্দুল্লাহ। সূত্র জানায়, একজন প্রভাবশালী এমপির নির্দেশে গুলশান থানা চীফ হুইপের পুত্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। বরং তাদের জামাই আদরে থানায় রাখা হয়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দু'পক্ষকে নিয়ে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেন। এখনও পর্যন্ত প্রশাসন ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

স্বাভাবিক কারণেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নুরুল হক শিকদারের পরিবার। তাদের দাবি অনুযায়ী অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টায় সাদেক আব্দুল্লাহ এ ঘটনা ঘটিয়েছে। সাদেক আব্দুল্লাহর ভাষ্যমতে পাজেরো জিপটি নাকি তার গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিল, তাই শত্রু ভেবে তিনি শটগান থেকে গুলিবর্ষণ করেন। এমন হাস্যকর বক্তব্য চীফ হুইপের পুত্রদেরই শোভা পায়। ক্ষমতার দাপটে তারা একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলছেন। পুলিশও এক্ষেত্রে নির্বিকার। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি চীফ হুইপের পুত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চোখে দেখেন না, নাকি তারা চীফ হুইপের পুত্রদের এসব ঘটনাকে সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যেই ফেলেন না?

‘পৃথিবীর কোথাও একজন প্রার্থীর পাঁচটি আসনে নির্বাচন করার সুযোগ নেই। একটি উপনির্বাচনে খরচ হয় পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা’

এম. এ. সাঈদ *প্রধান নির্বাচন কমিশনার*

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ জুনের আগেই নির্বাচন দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া মে মাসে নির্বাচন চেয়েছেন। নির্বাচন কমিশন কি এত দ্রুত নির্বাচন করতে প্রস্তুত?

এম. এ. সাঈদ : সরকার ও প্রধান বিরোধী দল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। প্রধানমন্ত্রী আগামী ১২ জুনের আগেই নির্বাচন চেয়েছেন। বিরোধী দল বলেছে মে মাসে নির্বাচন করতে। সময়টি বেশ কাছাকাছি। আমরা যে কোন সময় নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে প্রস্তুত। তবে কিছু সময় পেলে অবশ্যই ভালো হবে।

২০০০ : কবে নির্বাচন করতে চান?

এম. এ. সাঈদ : রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমেই সময় নির্ধারণ করা হবে। সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের পর। নির্বাচনের সময় আবহাওয়া এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার বিষয় চিন্তা করতে হবে। আগামী ১৫ মার্চ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। ১০ মে থেকে শুরু হবে এইচএসসি পরীক্ষা । চলবে ৩১ মে পর্যন্ত। ১৬ জুন থেকে শুরু আষাঢ় মাস। তবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি তারিখ নির্ধারণ করা যাবে বলে আশা করছি।

২০০০ : রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কি আলোচনা শুরু করছেন?

এম. এ. সাঈদ : ইতিমধ্যে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দিয়েছি আলোচনার জন্য। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দেয়া হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা করেছি। বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এ), জাতীয় পার্টি (মি-ম), জাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, গণফোরাম, জামায়াত ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, গণতন্ত্র পার্টিকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা রয়েছে কিনা। রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়, নির্বাচনী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি, নির্বাচনী ব্যয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে শীঘ্রই আলোচনা শুরু করবো।

২০০০ : প্রধান বিরোধী দল কি আলোচনায় আসবে?

এম. এ. সাঈদ : আমি পত্রিকায় দেখেছি তারা আলোচনায় আসবেন।

২০০০ : তারা তো শর্ত দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার শফিউর রহমানের বিষয়ে।

এম. এ. সাঈদ : আমি আশা করি তারা আসবেন। এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না।

২০০০ : নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর কি রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে?

এম. এ. সাঈদ : রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে

দে • য়া • ল • লি • পি

গরু মেরে জুতা দান

নারায়ণগঞ্জের ‘বড় ভাইয়ের’ লোকদের নির্দেশিত হাটে ভিড়াতে রাজি না হওয়ায় ‘বড় ভাইয়ের’ লোকেরা শীতলক্ষ্যায় গরু বোঝাই ট্রলার ডুবিয়ে দেয়। এতে মারা যায় ১৬টি গরু। নিঃস্ব হয়ে পথে বসে সিরাজগঞ্জের নয়টি পরিবার। সংবাদপত্রের শিরোনাম হবার কারণে ‘বড় ভাইয়ের’ ঐ লোকদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা ও যুবলীগ নেতার মধ্যস্থতায় ঐ গরুর মালিকদের ১৬টি গরুর জন্য দেড় লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। আর ট্রলার মালিককে দেয়া হয়েছে হাজার তিনেক টাকা। উল্লেখ্য যে, গরুর মালিকরা থানায় দেয়া এজাহারে তাদের ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করেছিল ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা। পুলিশ কর্মকর্তা ও স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতারা এভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু পাইয়ে দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। গরুর মালিক গৃহস্থরাও ‘নাই মামার চেয়ে কানা মামা’ই ভাল মনে করেছেন। তাদের কথা এই-ই বেশি। যেখানে ‘বড় ভাইদের’ দোহাই দিয়ে মানুষ খুন করে পার পেয়ে যাচ্ছে সেখানে গরু খুন করার জন্য বিচার আশা করা বৃথা। তাই নগদ যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

নির্বাচনের হজ ও ঈদ

এবার ঈদুল আযহা ছিল নির্বাচনের ঈদ। সাধারণ মানুষ ঈদের ছুটিতে গ্রামে যান। এবার তাদের সাথে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও দলে দলে গ্রামে গেছেন ঈদের সুযোগে প্রাক-নির্বাচনী গণ সংযোগের কাজ সেরে ফেলার জন্য। হজের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষনেতারাই সংখ্যায় অধিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি হজ থেকে ফিরে এসেই নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নামবেন। ছিয়ানব্বইয়ের মত এবারের নির্বাচনেও যে হজকে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করা হবে সেটা ধরে নেয়া যায়।

তারপরও স্বগোত্র

কথায় বলে কাক নাকি কাকের মাংস খায় না। কিন্তু বাংলাদেশের পুলিশের ঘুষের দাবির কাছে সব প্রবাদই অচল হয়ে গেছে। অচল হয়ে গেছে ঊর্ধ্বতন অধঃস্তন সম্পর্কেও। একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত একজন এসআইকে বাঁচাবার কথা বলে একজন কনস্টেবল এক লাখ টাকার ঘুষ দাবি করে। ঘটনাটি ঘটে ময়মনসিংহ ডিবি অফিসে। ঐ কনস্টেবল পদের দিক থেকে ঊর্ধ্বতন আরেক এসআই-এর কাছে এ দাবি জানালে সে অবশ্য রাজি হয়নি এবং ঐ কনস্টেবলকে থানায় সোপর্দ করে। পুলিশের মান বাঁচাতে জেলা পুলিশ সুপার তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না করে কেবলমাত্র মুচলেকা নিয়ে ঐ কনস্টেবলকে সেই রাতেই ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কনস্টেবলটি ভুল করলেও পুলিশ সুপার ভুল করেননি। হাজার হোক স্বগোত্র ত বটে!

নীতিমালা থাকা উচিত। অনেক দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিলেও কোনো জনভিত্তি থাকে না। রেজিস্ট্রেশনে বিষয়টির প্রস্তাব করছি। রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে বিবেচনা করবে। নির্বাচন তো তাদের।

২০০০ : ভোটার তালিকা তৈরির কাজ কবে শেষ হবে?

এম. এ. সাঈদ : ভোটার তালিকা তৈরির কাজ বেশ এগিয়েছে। কোনো কোনো জেলার ভোটার তালিকার কাজ তো শেষ হবার পথে। জয়পুরহাট, পাবনা, মেহেরপুর, শেরপুর, রাঙ্গামাটি জেলার ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ হবার কাজ শেষ। ৮০ থেকে ৮৯ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে সাতক্ষীরা, নরসিংদী, মাদারীপুর, সিলেটের। দিনাজপুর, পটুয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুরের কাজ শেষ হয়েছে ১ থেকে ৯ ভাগ। তবে গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে। এ হিসাব ঈদের আগের। আশা করি আগামী মাসের প্রথম দিকে বাকি কাজ শেষ হয়ে যাবে।

২০০০ : ব্যালট বাক্সের না কি ঘাটতি রয়েছে?

এম. এ. সাঈদ : আমাদের ব্যালট বাক্স মজুদ রয়েছে। তবে যা আছে আরো লাগবে। সোয়া দুই লাখ ব্যালট বাক্স মজুদ রয়েছে। দশ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স আরো প্রয়োজন। তবে এগুলোর জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

২০০০ : নির্বাচনে কত টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে?

এম. এ. সাঈদ : নির্বাচনে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। গত নির্বাচনের তুলনায় ৫ থেকে ১০ ভাগ ব্যয় বাড়তে পারে।

২০০০ : এবারও কি একজন প্রার্থীর পাঁচটি আসনে নির্বাচন করার সুযোগ থাকছে?

এম. এ. সাঈদ : আমরা একজন প্রার্থীর মাত্র দুইটি আসনে নির্বাচন করার প্রস্তাব দিয়েছি। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। একটি উপনির্বাচন করতে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা ব্যয় হয়। গরিব দেশের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা বেশ কষ্টসাধ্য। ভারতেও একজন প্রার্থী মাত্র দুইটি আসনে নির্বাচন করতে পারে।

২০০০ : তাহলে তো সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে।

এম. এ. সাঈদ : প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই তারা পরিবর্তন করবেন। পৃথিবীর কোথায়ও একজন প্রার্থীর পাঁচটি আসনে নির্বাচন করার সুযোগ নেই।

২০০০ : নির্বাচন কমিশনে জনবলের অভাব আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে নির্বাচনের কার্যক্রম কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

এম. এ. সাঈদ : নির্বাচন কমিশনে থানা পর্যায়ে বারোশ' পোস্ট খালি রয়েছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর। সেক্রেটারিএ্যাড পর্যায় রয়েছে ৭৬টি পোস্ট খালি। থানা পর্যায়ে নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালা করে পাঠানো হয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে তিন মাস আগে। সেখানেই নীতিমালা ফাইলবন্দি হয়ে রয়েছে। কর্মকর্তা পর্যায়ে ৭৬টি পোস্টে নিয়োগের জন্য শীঘ্রই সারকুলেশন দেয়া হবে।

২০০০ : দুইজন নির্বাচন কমিশনারের তো আগামী মাসেই মেয়াদকাল শেষ হচ্ছে?

এম. এ. সাঈদ : এ বিষয়ে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল সিদ্ধান্ত নেবে।

২০০০ : নির্বাচনে সেন্টারের সংখ্যা কি বাড়নোর বিষয়ে নীতিমালা হয়েছে?

এম. এ. সাঈদ : আমি আজ (১১ মার্চ) ভোটের রোল, ইলেকট্রোরাল রোল, ভোটার তালিকার প্রিন্টিং প্রোগ্রেস নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ নির্বাচনে সেন্টারের বিষয়েও নীতিমালা হয়েছে। অধিকাংশ বুথগুলো খুব অন্ধকারে থাকে। বুথগুলোর মান উন্নত করতে হবে।

২০০০ : নির্বাচনে অর্থ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে কি নীতিমালা হচ্ছে?

এম. এ. সাঈদ : আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে প্রশাসনের কাজ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না করা গেলে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করা যাবে না। নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়। তখন সন্ত্রাসীরা পৃষ্ঠপোষকতা পাবে কম। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে থাকবে। নির্বাচনে নীতিমালা খুব ভাল রয়েছে। এগুলোকে প্রয়োগ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলসহ সবার সহযোগিতা।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জয়ন্ত আচার্য**

দে • য়া • ল • লি • পি

তালেবানি তান্ডব

টেলিভিশনের বহুৎসব, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেয়ার পর আফগান তালেবানরা এখন নতুন তান্ডব শুরু করেছে। তারা আফগানিস্তানের হাজার হাজার বছরের পুরাকীর্তি ভেঙে ফেলছে। তাদের আক্রমণের মূলে রয়েছে আফগান জাতীয় জাদুঘরে রাখা বুদ্ধমূর্তি। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে বানানো বুদ্ধমূর্তিও তারা ভেঙে ফেলছে। ইসলামী ভাবাদর্শের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ দাবি করে সর্বোচ্চ তালেবান নেতা মোল্লা ওমর সব বুদ্ধমূর্তি ও স্থাপনা ভেঙে ফেলার এই নির্দেশ দেন। আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ ও সমালোচনাও তাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। হায় তালেবান! হায় আফগানিস্তান!

নির্বাচনী ছাড়

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আগামী বছর বাজেটে নিম্ন আয়ের মানুষদের ওপর থেকে করের বোঝা কমানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। বাজেট নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্সের সাথে আলোচনাকালে তিনি এ কথা জানান। অর্থমন্ত্রী ব্যাংক সুদের হার কমানোর কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলে এটাই হবে বর্তমান সরকারের শেষ বাজেট। আর বাজেটে এ ধরনের ছাড় দিয়ে অর্থমন্ত্রী তাকে নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগাতে চাচ্ছেন।

এরশাদ-মুক্তি নাটক

নির্বর্তনমূলক আটকাদেশের কারণে এরশাদকে আরেকটি ঈদ জেলে কাটাতে হল। জেল থেকে তার মুক্তি নিয়ে নাটক ঈদের বন্ধের আগের দিন পর্যন্ত চলে। এরশাদের মুক্তির জন্য জরিমানার টাকা পরিশোধ না করে বরং সেই ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করার জন্য জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট ছিলেন। সে ব্যাপারে তারা বিএনপি ও চারদলের ওপর চাপও দেন। এর মাঝে সরকারের সাথে সমঝোতা করে এরশাদকে চিকিৎসার নামে দেশের বাইরে পাঠাবারও চেষ্টা হয়। কিন্তু তাও সফল হয়নি। সব শেষে এরশাদকে ঈদের আগে জেল থেকে মুক্তি করে আনার জন্য তড়িঘড়ি করে তার জরিমানার বাকি অংশ দুই কোটি টাকার ওপর পরিশোধ করা হয়। এই টাকা কোথা থেকে এসেছে তা অবশ্য কেউ জানে না। জাতীয় পার্টি আশা করেছিল যে এবার এরশাদ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সরকার শেষ মুহূর্তে ঐ আটকাদেশ দেয়ায় এরশাদ জেল থেকে বেরুতে পারেনি। এমনকি ঐ আটকাদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এরশাদকে জামিন দিলেও সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে ঐ আদেশের কার্যকারিতার বিষয়ে স্থগিতাদেশ দিলে ঈদের আগে জামিনে জেল থেকে মুক্তি লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক তথ্য ভিজ্ঞ মহল বলছে যে, পড়তায় পোষাচ্ছে না বলে এরশাদের মুক্তি নিয়ে এই নাটক চলছে। এরশাদ এবার কিসের বিনিময়ে মুক্তি পান সেটা এখন দেখার বিষয়।